সমাজ (Society)

সমাজ দর্শনে যে সকল প্রত্যয় বা শব্দগুলি ব্যবহৃত হয় তন্মধ্যে সমাজ, সম্প্রদায় প্রভৃতি শব্দ খুবই গুরুত্ব পূর্ণ। এই শব্দগুলির প্রকৃত অর্থ অনুধাবন না করলে সমাজ দর্শন বা সমাজ বিজ্ঞানের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধ হবে না। তাই আমাদের প্রাথমিক কাজ হবে এই শব্দগুলি অর্থ অনুধাবন করা। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী তথা সমাজ দার্শনিকগণ 'সমাজ' শব্দটির যেভাবে অর্থ নিরূপণ করার চেষ্টা করেছেন, তা আমরা এখন আলোচনা করতে পারি।

মানুষ তার জন্মলগ্ন থেকে সমাজবদ্ধ জীব। সমাজেই মানুষ জন্ম গ্রহণ করে আবার সমাজেই মৃত্যুবরণও করে। এই সমাজই তার কাছে সবকিছু। শুধু মানুষের ক্ষেত্রে কেন যেকোন প্রাণীর ক্ষেত্রেই এই কথা প্রযোজ্য। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক ম্যাকাইভার ও পেজের (R. M. MacIver & Page) বক্তব্য খুবই প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেন, সমাজতত্ত্বে সর্বাধিক ব্যাপক ও সর্বপরিবেষ্টিত শব্দ হল 'সমাজ'। বস্তুতঃ এই সমাজ হল একটি সর্বজনীন ধারণা। শুধু তাই নয়, এ হল এমন একটি ধারণা যা সকল ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। মানব জীবনে সমাজের প্রয়োজনীয়তা হল অত্যন্ত স্বাভাবিক।

মানুষের সকল রকম পারস্পরিক সম্পর্কের দুরূহ জটাজালের যাবতীয় অর্থ এই ধারণার অর্ন্তভুক্ত বলে বিবেচিত হয়। সমাজকে প্রাচীনতম মানবিক সংগঠন বলে মনে করা হয়। সাধারণত মনে করা হয় মানবজাতির আবির্ভাবের সাথে সাথে সমাজের উদ্ভবের বিষয়টি সম্পর্কিত। সমাজ সম্পর্কিত তাত্ত্বিক আলোচনার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় গ্রীক দর্শনে। তারপর বিবর্তিত হতে হতে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান রূপ লাভ করেছে।

সাধারণ মানুষ ‘সমাজ’ বলতে নির্দিষ্ট একটি অন্তগোষ্ঠীর সদস্যদের বোঝে। অর্থাৎ সামাজিক সম্পর্ককে নয়, বিশেষ ব্যক্তিবর্গকে সমাজ নামে আখ্যায়িত করা হয়। এই অর্থেই ‘হরিজন সমাজ’ কথাটি ব্যবহার করা হয়। আবার অনেক সময় প্রাতিষ্ঠানিক অর্থে ‘সমাজ’ কথাটি ব্যবহার করা হয়। যেমন ‘ব্রাহ্ম সমাজ’, ‘আর্য সমাজ’ ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার ধর্মীয় গোষ্ঠী অর্থেও অনেক সময় ‘সমাজ’ শব্দটিকে ব্যবহৃত হতে লক্ষ্য করা যায়। যেমন ‘বৈষ্ণব সমাজ’, ‘শাক্ত সমাজ’ ইত্যাদি।

‘সমাজ’ শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল সম-অচ্ + ঘঙ্ করে সমাজ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। অর্থাৎ ব্যুৎপত্তিগত অর্থে সমাজ বলতে বোঝায়, একত্রে গমন, একত্রে বসবাস ইত্যাদি। বর্ণে বর্ণে মিলনে হয় সন্ধি। তেমনি মানুষে মানুষে একত্রে গমন, একত্রে বসবাসের ফলে গড়ে ওঠে সমাজ। ব্যক্তিজীবনের বিভিন্ন রকমের কাজকর্মের স্বার্থে এবং আশা-আকাঙ্খার পরিতৃপ্তির প্রয়োজনে মানুষ পারস্পরিক সহযোগিতার উপর নির্ভর করে। পারস্পরিক এই নির্ভশীলতার প্রয়োজনে সমাজবদ্ধ জীবনের সৃষ্টি হয়। প্রাণীদের মধ্যেও তাদের জীবন জীবিকার প্রয়োজনে যুথবদ্ধ হতে দেখা যায়। কিন্তু মানুষের সামাজিক সম্পর্ক ভীষণই জটিল প্রকৃতির। সাদৃশ্য ও সমতার ভিত্তিতে গোষ্ঠীবদ্ধতা এবং বৈসাদৃশ্য বা বিভিন্নতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পারস্পরিক স্বেচ্ছা সম্পর্কের মাধ্যমে মানুষ সমাজের বুনিয়াদ গড়ে তোলে। এই সামাজিক সম্পর্ক ক্রমশঃ বিচিত্র ও জটিল আকার ধারণ করে। আর এইভাবে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা বিচিত্র ও জটিল সামাজিক সম্পর্ককেই সাধারণভাবে সমাজ বলে।

কেউ কেউ সমাজকে একটি বিমূর্ত ধারণা বলে অভিহিত করেছেন। কোন ইন্দ্রিয়ের গণ্ডির মধ্যে একে পাওয়া যায় না। সমাজের কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্যিক অবয়বও নেই। এ হল সম্পূর্ণভাবে একটি অনুভূতির বিষয়। অধ্যাপক গিডিংস (Giddings) সমাজকে একটি মনস্তাত্ত্বিক ধারণা, একটি মানসিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে উল্লেখ করেছেন। জিসবার্ট এই প্রসঙ্গে বলেন, 'সামাজিকতা বা সমাজ হল একটি মানসিক বিষয়'। দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একই জায়গায় একই সময় অবস্থান করলে বা একই পথ ধরে একই দিকে যেতে থাকলে সামাজিকতা গড়ে ওঠে না। কারণ, এক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকে না।

কিন্তু তারা যখন পরস্পর পরস্পরকে জানার চেষ্টা করে, অথবা একে অপরের সম্পর্কে সচেতন হয়, কিংবা পরস্পরের মধ্যে কুশল বিনিময় করে বা বিবাদে লিপ্ত হয় তখনই সৃষ্টি হয় সামাজিকতার। জিসবার্টের অভিমত অনুসারে 'সমাজ হল সামাজিক সম্পর্কের একটি জটিল জাল। এই সম্পর্কের দ্বারা প্রত্যেক মানুষ তার সঙ্গীদের সঙ্গে যুক্ত। গ্রীন(A. W. Green) এই প্রসঙ্গে বলেন, 'সমাজ হল একটি বৃহত্তর গোষ্ঠী যেখানে যে-কোন ব্যাক্তি অবস্থান করে।' আর এই সকল আলোচনা থেকে বোঝা যায় সমাজ সম্পর্কে একটি সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞা পাওয়া খুবই দুষ্কর বিষয়। তাই সমাজতত্ত্ববিদদের মধ্যে এই সম্পর্কে এত মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

বিভিন্ন সমাজতত্ত্ববিদ্ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজের সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। অধ্যাপক ম্যাকাইভার ও পেজ পরিবর্তশীল সামাজিক সম্পর্ককেই সমাজ হিসাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর ভাষায় 'It is the web of social relationship. And it is always changing।' এই সম্পর্ক আসংখ্য ধরনের হতে পারে। এই সকল সামাজিক সম্পর্কের একটি সম্পূর্ণ তালিকা নির্ণয় করা সহজ নয়। সামাজিক সম্পর্কের ধরণ-ধারণ অত্যন্ত জটিল প্রকৃতির এবং এর পরিধিও অতিমাত্রায় ব্যাপক। সুনির্দিষ্ট কোন ব্যবস্থা বা কাঠামোর মধ্যে একে আনা যায় না। কেবল শুধু পরিবারের মধ্যে বয়স, স্ত্রী-পুরুষ ও পুরুষানুক্রম-এর পরিপ্রেক্ষিতে কম করে পনের ধরনের সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। পরিবারের বাইরে সম্ভাব্য সম্পর্কের সংখ্যা নির্ধারণ করা অতীব দুরূহ কাজ।

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ম্যাকাইভার ও পেজ বলেন, ‘সমাজ হল বিভিন্ন প্রথা ও পদ্ধতি, কর্তৃত্ব ও পারস্পরিক সাহায্য, গোষ্ঠী ও সামাজিক শ্রেণীসমূহ এবং মানুষের আচরণ ও স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণের একটি ব্যবস্থা বিশেষ।’ অধ্যাপক গিডিংস বলেন, নিজেদের ঐক্য সম্পর্কে সচেতন সমমনোভাবাপন্ন কিছু সংখ্যক ব্যক্তি অভিন্ন লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার উদ্দেশ্যে একযোগে চেষ্টা করলে সৃষ্টি হয় সমাজ।

অধ্যাপক মরিস গিনস্‌বার্গ এই প্রসঙ্গে বলেন, 'মানুষের সাথে মানুষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, সংগঠিত বা অসংগঠিত, সচেতন বা অচেতন, সহযোগিতা বা বৈরীতামূলক সমস্ত সম্পর্কই হল সমাজ।' গিনস্‌বার্গ 'সমাজ' ও 'একটি সমাজ' এই দুটি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তাঁর মতে, সমাজের ব্যাপ্তি অত্যন্ত বিশাল। বস্তুত একে কোন নির্দিষ্ট সীমারেখায় আবদ্ধ রাখা যায় না। তাছাড়া সমাজ হল সার্বভৌম। অপরদিকে, কতকগুলি আচরণ-পদ্ধতি বা সম্পর্কের দ্বারা যুক্ত ব্যক্তির সমষ্টি বা গোষ্ঠীই হল 'একটি সমাজ'। সমাজ হল সাধারণ ও সামগ্রিক। পক্ষান্তরে একটি সমাজ হল নির্দিষ্ট। সমাজ বিমূর্ত, কিন্তু একটি সমাজ বিমূর্ত নয়।

অধ্যাপক জিসবার্ট গিনস্‌বার্গের অনুরূপ অভিমত পোষণ করে বলেন, ‘সমাজ হল সামাজিক সম্পর্কের এক জটিল বন্ধন, যার দ্বারা প্রত্যেকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকে।’ সি. এইচ্. কুলে(C. H. Coole) এই প্রসঙ্গে বলেন, ‘সমাজ হল একটি জটিল আকার বা পদ্ধতি যেখানে প্রত্যেকে বসবাস করে এবং বেড়ে ওঠে একে-অপরের আন্তঃসম্পর্কের মাধ্যমে।’ ডক্টর টিমাসেফ (Dr. N. S. Timasheff) অনুরূপ অভিমত পোষণ করে বলেন, সমাজের সদস্য ব্যক্তিবর্গের সম্পর্কই হল সমাজ। পিয়ারসন(Pearson) বলেন, ‘সমাজ হল মানুষের মধ্যেকার একটি জটিল সম্পর্ক যা বেড়ে ওঠে তাদের কার্য প্রণালীর মাধ্যমে, প্রকৃত অর্থে এই সম্পর্ক অন্তর্জাত অথবা প্রতীকী।

উক্ত সজ্ঞাগুলির মধ্যে আমরা কতকগুলি মৌলিক ঐক্য লক্ষ্য করতে পারি। সমাজ সৃষ্টির মূল কথা হল মানুষের পারস্পরিক মেলামেশার মাধ্যমে সৃষ্ট সামাজিক সম্পর্ক। পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ এবং এই সম্পর্কের ব্যাপারে সচেতন মানবগোষ্ঠীই হল সমাজ। বিভিন্ন মানুষের পারস্পরিক সচেতন, ঐক্যবোধ ও সহযোগিতা সমাজ গঠনের ভিত্তি রচনা করে। তবে অধ্যাপক গিনস্‌বার্গ সমাজ সম্পর্কে এই ধারণাকে সংকীর্ণ বলে মনে করেন। তাঁর মতে সমাজের প্রকৃতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মানুষের সকল রকম সম্পর্কই বিবেচিত হওয়া উচিত। শুধুমাত্র রক্তের, বন্ধুত্বের বা সহযোগিতার নয়, যে কোন রকম সম্পর্কই হল ‘সমাজ’ ধারণার অন্তর্গত।

এছাড়াও সমাজবদ্ধতার মূল ভিত্তি হল অভিন্নতা (likeness) ও বিভিন্নতা (difference)। কিছু মানুষের দৈহিক ও মানসিক সাদৃশ্য বা সমতা এবং এ বিষয়ে সচেতনতা ছাড়া সমাজের সৃষ্টি সম্ভব নয়। জিসবার্ট এই প্রসঙ্গে বলেন, সমাজ গড়ে ওঠার মূলে বৈসাদৃশ্য বা বিভিন্নতার গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। সমাজবদ্ধতার প্রকৃতির মধ্যে সাদৃশ্য বা অভিন্নতার মত বৈসাদৃশ্য বা বিভিন্নতাও বর্তমান থাকে। মানুষের মধ্যে সকল ক্ষেত্রে যদি কেবল সাদৃশ্যের সম্পর্কই থাকত তাহলে সমাজের বন্ধন অচিরেই শিথিল হয়ে যেত। সামাজিক বন্ধন বলে প্রকৃতপক্ষে কিছুই থাকত না। সমাজের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে অভিন্নতা ও বিভিন্নতা উভয় সম্পর্কই বর্তমান।

আর এই জন্যই ম্যাকাইভার ও পেজ এই প্রসঙ্গে বলেন, সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে অভিন্নতা ও বিভিন্নতা উভয়েরই গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনস্বীকার্য। এতদ্‌সত্ত্বেও এক্ষেত্রে অভিন্নতাকে প্রধান্য দেওয়া হয়। এই কারণে এ ক্ষেত্রে অভিন্নতার তুলনায় বিভিন্নতা গৌণ।

বস্তুতঃপক্ষে সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয় মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির তাগিদে। একই ব্যক্তি নানাভাবে অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এই জটিল সামাজিক সম্পর্ক বন্ধনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে সমাজ। তাই ত সমাজ দার্শনিকগণ বলেন, সমাজ হল মানুষের মধ্যেকার এই বিচিত্র সম্পর্কেরই এক জটাজাল যা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির ফল বলা যেতে পারে।

এছাড়া মানব সমাজের একটি সাংগঠনিক রূপের অস্তিত্বও অস্বীকার করার উপায় নেই। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক যদি মোটামুটি স্থায়ী হয় এবং এই সম্পর্ক দৃঢ় হয়, তাহলে সৃষ্টি হয় সামাজিক সংগঠনের। এই সকল সংগঠনের মধ্যে যেমন রাষ্ট্রের মত দীর্ঘস্থায়ী সংগঠন আছে তেমনি আবার 'ভিড়'(crowd)- এর মত অল্পস্থায়ী সংগঠনও আমরা দেখতে পাই। সামাজিক সংগঠনসমূহের মধ্যে যেমন পরিবারের মত ক্ষুদ্রাকৃতি সংগঠন আছে, তেমনি আবার সংঘ-সমিতির মত বৃহৎ আকারের সংগঠনও আছে। এই সাংগঠনিক প্রকাশের মাধ্যমে সমাজের বাস্তব পরিচয় ফুটে ওঠে। বহুবিধ বিচিত্র সামাজিক সংগঠনগুলির একত্র উপস্থিতিতে সমাজ সমৃদ্ধি লাভ করে। ব্যাপক অর্থে যে কোন প্রকার সামাজিক সম্পর্ককেই 'সমাজ' আখ্যা দেওয়া যায়। তবে সংকীর্ণ অর্থে 'সমাজ'কে মোটামুটি একটি স্থায়ী সংগঠন বলে গণ্য করা হয়। মানুষের সামাজিক সম্পর্কসমূহ এই সংগঠনের মাধ্যমে অভিব্যক্তি লাভ করে।

সামাজিক সম্পর্ক বহু ও বিচিত্র রকমের হতে পারে। সমাজ যত বেশি জটিল হয় তার সম্পর্কের জটিলতাও তত বৃদ্ধি পায়। ভোট প্রর্থীর সাথে ভোটদাতার, পিতামাতার সাথে সন্তানের, মালিকের সাথে শ্রমিকের বন্ধুর সাথে অন্য বন্ধুর সম্পর্ক সামাজিক সম্পর্ক। সামাজিক সম্পর্ককে আবার বিভিন্ন প্রকারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যেমন - পারিবারি, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ব্যক্তিগত- নৈর্ব্যক্তিক, বন্ধুত্বমূলক-বিদ্বেষমূলক ইত্যাদি ইত্যাদি। স্বামী-স্ত্রীর, পিতা-মাতা-সন্তানের, ভাই-বোনের পারিবারিক সামাজিক সম্পর্ক; ভোটপ্রার্থী-ভোটদাতার সম্পর্ক রাজনৈতিক সামাজিক সম্পর্ক, মালিক ও শ্রমিকের, ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্পর্ক অর্থনৈতিক সামাজিক সম্পর্ক। বন্ধুর সাথে বন্ধুর ব্যক্তিগত সামাজিক সম্পর্ক, ভক্তের সাথে ভগবানের নৈর্ব্যক্তিক সামাজিক সম্পর্ক। এ সকলের প্রতি ক্ষেত্রেই ‘পারস্পরিক সম্বন্ধ’ সম্পর্কে চেতনা এবং ঐক্যবোধ থাকার জন্য সেসব সামাজিক সম্পর্ক।

যেখানেই ঐক্যবোধজনিত গোষ্ঠীজীবন সেখানেই সমাজ। ইতর প্রাণীদের মধ্যেও উঁচু-নীচু বিভিন্ন স্তরের সমাজ আছে। পিপীলিকা, মৌমাছি, ভ্রমর ইত্যাদি কীট-পতঙ্গদেরও সমাজ আছে। পাখীদের এমনকি বন্য হস্তীদেরও সমাজ আছে। এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় যে যেখানেই প্রাণের অস্তিত্ব সেখানেই সমাজ। তবে ইতর প্রাণীদের মধ্যে 'সামাজিক সম্পর্ক' সম্বন্ধে চেতনা নিতান্তই অস্পষ্ট থাকে, তা কেবল আত্মরক্ষা, বংশবৃদ্ধি ও সন্তান পালনের মতো সংকীর্ণ প্রয়োজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কেবল চেতনাগত মিল ও ঐক্যই থাকে না, অমিল বা অনৈক্যও থাকে। বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা যেমন সামাজিক সম্পর্ক, শত্রুতা ও বিরোধিতাও তেমনি সামাজিক সম্পর্ক। সামাজিক সম্পর্ককে বুঝতে গেলে মিল ও অমিল, সহযোগিতা ও বিরোধিতা, সম্মতি ও অসম্মতি প্রভৃতি দ্বিমুখী বিরোধী মনোভাবের মধ্য দিয়েই বুঝতে হয়। জিসবার্ট এই প্রসঙ্গে বলেন, 'সমাজ যদি কেবল মিল বা ঐক্যের ওপর নির্ভশীল হয় তাহলে সামাজিক বন্ধন অতিমাত্রায় শিথিল হয়ে পড়ে এবং সেক্ষেত্রে পাস্পরিক দেওয়া-নেওয়া বা আদান-প্রদানের কোন অবকাশ থাকে না। সমাজে বিরোধিতারও প্রয়োজন আছে।'

বাস্তবিকপক্ষে, অভিন্নতা ও ভিন্নতার, সহযোগিতা ও বিরোধিতার সম্পর্ককে নিয়েই সমাজ। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে, পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে, ভাই ও বোনের মধ্যে, ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে যেমন মিল আছে তেমনি অমিলও আছে। এই অমিল বা পার্থক্য আবার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। স্ত্রী-পুরুষের পার্থক্য শরীরগত, মালিক-শ্রমিকের পার্থক্য অর্থনৈতিক, শাসক-শাসিতের পার্থক্য রাজনৈতিক ইত্যাদি ইত্যাদি। তেমনি আবার মানুষের সাথে মানুষের শিক্ষা, সংস্কৃতি, শক্তি, বুদ্ধি, দক্ষতা, রুচি ইত্যাদিরও পার্থক্য দেখা যায়। সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে এসকল ভিন্নতার সম্পর্কেরও প্রয়োজন আছে। কেবল অসহযোগিতা বা বিরোধিতা যেমন সমাজজীবনকে দুর্বল করে, কেবল সহযোগিতা ও সমমর্মিতার সম্পর্কও তেমন সমাজের পরিবর্তন ও অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করে।

তাই ম্যাকাইভার ও পেজ বলেন, সব মানুষের মধ্যে যদি সম অচরণ ও সমতাবুদ্ধি থাকে তাহলে তাদের মধ্যে সামাজিক আদান প্রদানের, সহযোগিতার সম্পর্ক বলেও কিছু থাকতে পারে না এবং তার ফলে সমাজ বলেও আর অবশিষ্ট কিছু থাকে না। যুদ্ধকালে বিবদমান দুটি দেশের সৈন্যদলের মধ্যে যে সম্পর্ক, ম্যাকাইভার ও পেজ তাকেও 'সামাজিক সম্পর্ক' বলেছেন, কারণ তাদের একপক্ষ অন্যপক্ষের উপস্থিতি সম্পর্কে সর্বদা সচেতন থাকে এবং উভয় পক্ষই বিশেষ এক লক্ষ্য সাধনের জন্য পরস্পরের মুখোমুখি হয়।

তবে বিরোধিতার সম্পর্ক সামাজিক সম্পর্ক হলেও সহযোগিতা ও সহমর্মিতার সম্পর্কই হল মুখ্য সামাজিক সম্পর্ক। সমাজের প্রাণকেন্দ্র বা ভিত্তিভূমি নিহিত আছে সমতাবুদ্ধি ও ঐক্যবোধে। ম্যাকাইভার ও পেজ এজন্য সহযোগিতা ও সহমর্মিতার সম্পর্ককে মুখ্য সামাজিক সম্পর্ক ও বিরোধিতার সম্পর্ককে গৌণ সামাজিক সম্পর্ক বলেছেন। এই দুই প্রকার সম্পর্কের জটাজালই হল সমাজ।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ